ব্যাটসম্যানরাও হয়তো চক্ষুলজ্জার খাতিরে দু'একটা রান করবেন। আকরাম সাহেব কিছুই করবেন না তা তো হয় না! কিছু নিশ্চয়ই করবেন।

মামা জোরে জোরে হাঁকলেন। অবশ্য করবেন, গগল্‌স পরে খেলবেন, ডাইভ দিয়ে বল ধরবেন। বেশি কষ্ট হলে হাঁসফাঁস করবেন।

মামানি হাঁকালেন—শাট আপ, পিনড্রপ সাইলেন্স, নো ডিস্টারবেঞ্চ।

মামা ভড়কে থেমে গেলেন। তাকালেন অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে মামানির দিকে। সত্যি সত্যিই ঘরে সবার সোরগোল কমে এলো। টেলিভিশনে তখন বোলার আর ব্যাটসম্যানদের প্রস্তুতি চলছে।

মামানি আবারও শুরু করলেন—আমি বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের কোন কর্তাব্যক্তি হলে আকরাম সাহেবকে ডেকে বলতাম—ভাই আপনি দয়া করে চোখের কালো চশমাটা খোলেন। মুখের চুইনংগাম ফেলে দিয়ে মন লাগিয়ে খেলেন। জুনিয়র ব্যাটসম্যানদের উপদেশ দিয়ে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই। বুঝতে পারছি মাঠ থেকে বল কুড়াতে গেলে ভুঁড়িতে চাপ পড়ছে। একটু কষ্ট তো করতেই হবে। আমি কি রূঢ় কথা বলে ফেলেছি? হ্যা বলেছি। আকরাম সাহেব যদি অস্ট্রেলিয়ার সাথে তেমন কিছু করেন তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে যাবো। এবং পরবর্তিতে আন্তর্জাতিক খেলায় তাকে দলে না নেয়া হলে হৈ চৈ করবো। বাংলাদেশের মানুষ খারাপ টা মনে রাখে না। দ্রুত ভুলে যায়।

ভাইয়া এতোক্ষণে বিজ্ঞের মতো মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন—কথাটা ঠিক।

ভাইয়া আর মামা পাশাপাশি বসে। মামার পরনে হাওয়াই শার্ট। হাসান ব্র্যাঘের শক্তি দিয়ে বল পিটিয়েছে। ছুটছে বল উইকেট কিপারকে পরাস্ত করে। দু'টো ড্রপ খেয়ে বাউন্ডারির কাছাকাছি। ফিল্ডার লম্বা পায়ে চিতার ক্ষিপ্রতায় ছুটছে। না পরাস্ত হলো। এখন সে নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত। বল বাউন্ডারি পার। মামানি ডান হাতে পেপার নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই খেলা উপভোগ করছেন।

মামা হঠাৎ হাততালি দিয়ে চিৎকার করে সটান উঠে দাঁড়ালেন। ব্রাভো বাংলাদেশ! কোন দিকে মামার খেয়াল নেই। দু'হাত উপরে তুলে নাদুস নুদুস পেট কাঁপিয়ে চিৎকার করে বলছেন, ব্রাভো বাংলাদেশ! ব্রাভো বাংলাদেশ!

আমিও আস্তে আস্তে মামার সাথে হাততালি দিলাম, ব্রাভো বাংলাদেশ! ব্রাভো বাংলাদেশ!

এই লেখাটি লাখো বাঙালি ক্রিকেট অনুরাগদের জন্য উৎসর্গীকৃত। এটি বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের পাকিস্তানি দলের বিরুদ্ধে স্মরণীয় (বিজয়ের আগের দিনের লেখা।

দাদা

দাদা ডাব খাব।

ভর দুপুরে?

দু'টো ডাব পেড়ে দাও না, দাদা। রাহেলা আবদারের সুরে বললো।

তোর পেটে কি রাক্ষস ঢুকছে? দুপুর বেলা এখন তো ভাত খাবি, যা ভাত খা গিয়া। ঘরে রান্না অয় নাই?

দাদার কণ্ঠে সামান্য তিরস্কার।

রান্না হবে না কেন? দাদা, ভাত আর ডাব কী এক হলো? গ্রামে আসিই বা বছরে ক'বার।

হ তা এই দুপুরে আমারে গাছে উডাবি?

এলাকায় শিকদার দাদা নামে পরিচিত। তিনি পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে সবার বড়। তেমন কিছু করেন না। তবে অমায়িক, বাবা-মা হারাবার পর সংসারের হাল ধরে আছেন শক্ত করে। শুধু নিজেদেরই নয়, পাড়া প্রতিবেশীদের কোন অনুরোধও সাধ্যে থাকলে তিনি রাখেন। ছোট বোন রাহেলার স্বামী শহরবাসী। ভাল চাকরি করে। কাজেই ওরা বাড়িতে এলে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। এবারেও এসেছে দিন তিনেক হলো।

বাচ্চু রাহেলার স্বামী। সে মনে করে প্রত্যেক শীতে গ্রামে এসে দিন দশেক না থাকলে গ্রামের সাথে দিলের টান কমে যায়। কথাটা একদম বেহুদাও বলেনি সে। দাদা সে কথা সমর্থন করেন। বলেন, বাচ্চু মিয়া খাঁটি কথা কইছ, তোমরা আইবা, যখন খুশি চইল্লা আইবা।

শীতের দিনে পথঘাট শুকনো, আর তাছাড়া বোনাস হলো, পায়েস? রসের হরেক রকম পিঠা আর কুয়াশা ভাঙা ভোরে মিঠা মিঠা রোদে সবাই মিলে রোদ পোহানো।

তবে ঘরে ভাবি থাকলে আরো ভাল হতো—বলে বাচ্চু হাসে। দাদার সমর্থনের জন্যে, তাঁর দিকে তাকায়।

দাদাও মুচকি হাসেন। বলেন—কইছ ঠিকই, তয় কামডা এহন অইব না। আরো কিছুডা সময় লাগবো।

হ্যাঁ, ওরা আসে প্রত্যেক শীতে, আসে শীতের পাখির মতো কিছু দিনের জন্য। এ বড় পরিবারে বাচ্চুরা একটা ছোট হিস্যা মাত্র। আসে বাদল ও পান্না। ওরা দাদার চাচাত ভাইবোন। চাকরির কারণে ওরা দেশে আসার সুযোগ পায় কম। তবে আসে

সাধারণত পৌষ বা মাঘে। দাদার ছোট অন্য দু'বোনের বিয়ে কাছাকাছি। দু'বোনের স্বামীই স্কুল শিক্ষক। মাইল বিশেকের মধ্যেই তাদের অবস্থান। তাদের আসার অবশ্য কোন সিজন নেই। যখন খুশি ওরা আসে এবং আসে সদলবলে। ওদের কেউ কেউ আবার ছোট ভাই কিংবা বড় ভাইয়ের ছেলেকেও সংগে করে নিয়ে আসে এ বাড়ির আদর অ্যাপায়নে খুশি হয়ে।

সবার দাদা মাথা কাত করে বলেন—ঠিক। তাঁর কোন রাগ বা বিরাগ নেই। সবাইকে খুশি করার চেষ্টায় সংসারের হাল তাঁকে ধরতে হয়েছে। ছোট দু' ভাইয়ের লেখাপড়ার দায়িত্ব পুরাটাই তাঁর। ওরা সবুজ আর রানা। অবশ্য লেখা পড়ায় ভাল। শুধু ভাল বলে কমই বলা হবে। ওরা লেখাপড়ায় বেশ ভাল। প্রত্যেক ক্লাশেই প্রথম হয়। যখন বছর শেষে রেজাল্ট শিট হাতে করে ফেরে, খুশিতে ডগমগ করে দাদা ওদের কাঁধে করে পুকুর পাড়ে, বাগানে, মাঠের আলে সব জায়গায় মহা উচ্ছ্বাসে ঘুরে বেড়ান।

ছেলেবেলার বন্ধু কাজেম বলে—দাদা, দুই ভাইতো একত্রে কান্ধে নিছেন।

দাদার মুখ খুশিতে জ্বল জ্বল করে। বলেন—ওরা আমার আনন্দ, ওরা আমার গর্ব। আমি বুড়া অইলে ওরা আমারে দেখবে।

দাদা আত্মবিশ্বাসে তৃপ্তির হাসি হাসেন।

কাজেম বলে—দাদা, বিয়ে করেন। আপনার নিজের সংসার লাগবো না?

লাগবো না ক্যান? আমার সংসার তো আমার কান্ধে, দেখতে পাওনা? নাকি চোখের মাথা খাইছ?

কাজেম গম্ভীর। বলে—দাদা, আফনের কান্ধে তো আস্ত দুই সংসার। আমি আপনের নিজের সংসারের কথা কইছি।

দাদা হাঁটতে হাঁটতে বলেন—আমি বিয়া করলে সংসারের খরচ বাড়ব। এমনেই তো কত খরচ, ওদের ভবিষ্যতে লেখা পড়ায় কষ্ট অইব। না কাজেম মিয়া, আপাতত বিয়া টিয়া থাউক, আগে আল্লায় ওগো বড় বানাউক।

হ। কাজেম মাথা নাড়ে। বলে দাদা, আফনে জ্ঞানী। যেডা ভাল মনে করেন। বলে নিজের কাজে চলে যায় কাজেম।

রাহেলার ছেলে সাজু এতক্ষণ মা'র আঁচল ধরে দাঁড়িয়েছিলো। এবার ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে এগিয়ে যেয়ে দাদাকে ডেকে উঠে, দাদা লই খাব, রাহেলা হায় হায় করে উঠলো। বললো—পাজি, বলো মামা।

দাদা হাসলেন। আদর করে সাজুর নরম নাক ধরে একটা টান দিলেন।

বললেন—লই কিরে মামা?

রাহেলা বললো—দাদা, ও ডাব খেতে চাইছে।

আদর করে ভাগ্নেকে কোলে তুলে নিলেন দাদা। বললেন—ওরে আমার মামা, লই খাবে, গুরুত্ব গুরুত্ব কইর‍্যা লই খাবে। তা এতো সুন্দর নাম কোথায় শিখলা?

সাজু ছোট দুই হাতে দাদার গলা ধরে বললো—দাদ্দা লই ল........ই খাব।

দাদা সাজুকে কোল থেকে নামালেন। একবার তাকালেন সূর্যের দিকে। ঠিক মাথার উপরে উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে ওটা। কাছেই পশ্চিমের বাগানে পুকুর পাড়ে নারকেল গাছ। নিশ্চয় ওখানে ডাব আছে। কাঁধ থেকে গামছা নিয়ে অভ্যাস বশে মুখ মুছলেন তিনি, বাঁধলেন ওটা কোমরে। মাল কোচা মারতে মারতে দাদা বললেন—মামা, তুমি খাড়াও, আমি এহনই তোমার জন্য লই আনব। বলে লম্বা লম্বা পা ফেলে পুকুরের দিকে হাঁটা শুরু করলেন দাদা।

২

দাদা বেশ আমুদে, গল্পে বড্ড পাকা। যখন ভাই, বোন, ভাগ্নে কিংবা পাড়া প্রতিবেশীদের মাঝে বসে গল্প করেন, ডাহা মিথ্যা কথাটাকেও নির্বিকার সত্য বলে চালিয়ে দিতে তিনি বড় ওস্তাদ।

রানা ক্লাশ সেভেনে পড়ে। সে বারান্দায় বসে পড়ছে। সবুজ গ্রাম ছেড়েছে বছর দু'য়েক হলো। কলেজে পড়ে বলে শহরে যেতে হয়েছে ওকে। হঠাৎ প্রচণ্ড কান ফাটান শব্দে আতঙ্কিত হয়ে উঠলো রানা। মনে হলো পৃথিবী ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। কাছেই কোথায় একলা এক কোকিল ডাকছিলো। দু'পায়ে ডাল আঁকড়ে ধরে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে ওটা। কতকগুলো কবুতর আনন্দে বাক বাকুম করছিলো ঘরের চালায়। ভড়কে উঠে পাখা ঝাপটাতে ঝাপটতে ওরা গা ভাসালো, বাতাসে। দু'টো কুকুর প্রচণ্ড ক্রোধে ঝগড়া করছিলো ঘরের কোনায়। লেজ নামিয়ে ওরা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে কুই কুই শুরু করলো।

হঠাৎ করেই আবার নাই হয়ে গেলো শব্দটা। তবে আবার সবার ভয় ভেঙে স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় নিচ্ছে প্রকৃতি। কিছুক্ষণ পর দাদা ডান বগলে একটা ছাতা নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে ফিরলেন।

রানা ভড়কে যাওয়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—দাদাভাই, এতো জোরে শব্দ হলো ওটা কিসের? আমার তো সারা শরীরে কাঁপুনি ধরে গেছে।

হড়বড় করে দাদা বললেন—চারটা উড়ু জাহাজ একসাথে উড়াল দিছে, মাটি ছুঁই ছুঁই অবস্থা, তোদের স্কুলের খোলা মাঠটার এক বিঘত উপর।

রানা আদর করে ওর বড় ভাই দাদাকে দাদাভাই বলে ডাকে। ও সংসারে সবার ছোট বলে সবার আদরেরও বটে। দাদাভাইয়ের কথা শুনে ওর চক্ষুতো চড়কগাছ।

বিস্মিত হয়ে বললো—বলো কী? একবারে চার চারটে, তাও আবার মাটির এক বিঘত উপর। তা তুমি কোথায় ছিলা, দাদা ভাই?

কোথায় আর থাকমু! মাদ্রাসার হাটে গেছিলাম বাজার করতে।

কত বড় প্লেন দাদা ভাই? আগ্রহে রানার চোখ জ্বল জ্বল করছে।

বেশি বড় না, আমাগো দেশি ডোঙ্গা নাওয়ের মতো, একজন কইর‍্যা ড্রাইভার ছিলো ভিতরে।

তাও দেখছ দাদাভাই? রানার বিস্ময় বাড়ছে।

দাদা এবার বিজ্ঞের মতো মুচকি হাসি দিয়ে বললেন—শুধু দেহি নাই, হুনছিও।

কি? কি শুনছ দাদা ভাই? উত্তেজনায় রানার শরীর টানটান।

আরে হোন, বলে দাদা ছাতাটা রেখে ছোট ভাইয়ের সাথে বেঞ্চির উপর বসলেন। বললেন—আমি তো মাঠের কোণে খাড়াইয়া রইছি। মিয়াসাব, ঐ যে তোগো হুজুর, যাইতেছিলো মাঠের মধ্য দিয়া সদরে। হঠাৎ কড় কড় শব্দে চাইয়া দেহি, চাইরডা—দুইডা সামনে আর দুইটা পিছনে, মাঠ ছুঁই ছুঁই, ছুঁইট্টা আইলো যেন পাগলা ঘোড়ার দৌড়। আর মেয়াসাবে মাটির মধ্যে শুইয়া মনে অইলো কবরে ঢুকবার জন্য খাবি খাইতে লাগছে। যহন ঠিক আমার বরাবর আইলো, তখন পিছনের দুই ড্রাইভার একজন আরেক জনের দিকে তাকাইয়া সামনের দুইটার দিকে আঙুল উচাইয়া ক.....ই......লো....বলে দাদা চোখ বড় বড় করে তাকালেন রানার দিকে।

কি, কি কইলো, দাদাভাই! রানা উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছে।

হাসলেন দাদা, তাঁর পেশিতে ঢিল পড়লো।

বললেন—সামনের দুহটা মনে হয় শত্রুগো। কইলো, ধর হালাগো, ছেইচ্যা ফালা।

তুমি স্পষ্ট শুনছ? বলো কী? এতো শব্দের মধ্যেও? রানার বিস্ময় মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। দাদা ছাতাটা নিয়ে উঠতে উঠতে বললেন—তয় আর কইলাম কি। তোর কী মনে অয়, আমি কি কানে কম হুনি?

বলে দাদা আর দাঁড়ালেন না, ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন ব্যস্তভাবে।

রানা মাথা চুলকাতে থাকলো। মনে মনে বললো, এতো শব্দের মধ্যে ওদের কথাবার্তা দাদাভাই শুনলো কী করে!

রানা দাদাভাইয়ের কাছে মাঝে মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনতে চায়। দাদাভাই রসিয়ে রসিয়ে বলেন তাঁর অল্প বিস্তর অভিজ্ঞতা। এইতো সেবার যখন ছোট ফুপি আসলো, দাদা ভাই পান মুখে বললেন—বললে তো তোর বিশ্বাস করবি না, ভাববি আমি ফাও দাও মারি, কথাডা একদম হাছা না। নিজ চোখে আমি পাকিস্তানিদের নাস্তনাবুদ অইতে দেখছি। ছোটরা তখন শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকে। ফুপা এক খিলি পানের সাথে চুন মিশিয়ে মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বললো—দাদা, বলেন, বাচ্চারা শুনুক পাকিস্তানিদের বেহাল অবস্থা। বেজন্মারা তো আর আমাদের কম জ্বালায় নাই।

হ, মাথা দুলিয়ে দাদা শুরু করলেন। তহন এপ্রিল মাস। মা কইলেন—যা, তোর মামারা কেমন আছে, দেইখ্যা আয়। আমি ভোর বেলা পেট ভইর‍্যা খাইয়া ছাতি হাতে ছোট হারজি চললাম। ওখানে যহন পৌঁছলাম, তহন সূর্য বেজায় তেজে বজ্জাতি শুরু করছে।

সবার চোখে অবাক দৃষ্টি—দাদা, সূর্যের বজ্জাতি বুঝলাম না।

দাদা পান চিবুতে চিবুতে বললেন—তা বুঝবি কি, সূর্যের তাপে ছাতিও গরম, আমার মাথাও গরম। মনে অইলো আধা কেয়ামত বুঝি নাজিল অইলো।

সবাই একযোগে বললো—অ-অ-অ------

তারপর দাদা, পাকিস্তানিদের কী হইলো? ফুপার কণ্ঠে আগ্রহ।

কী আর অইব? পান চিবুচ্ছেন দাদা আয়েস করে। একটা লম্বা ঢোক গিলে বললেন—দেখি সবাই খালি দৌড়াদৌড়ি করতে লাগছে। বড় মামা যখন আইলো দেহি, দাদা একটু দম ধরে বললেন—হের রাঙ্গা মুখটা আরও রাঙ্গা, বুকটা ঘন ঘন উঠানামা করতেছে। বললো, খবর আছে, আমুয়া নদীতে একটা গানবোট নিয়া পাকিস্তানিরা ঢুকছিলো। চরে নাইম্যা জিগাইলো—মুক্তি হ্যায়? অমনি শয়ে শয়ে লোক বল্লম, রাক্সা নিয়া ছুটল পাকিস্তানিদের দিকে। দুইজন নদীতে লাফাইয়া কোনমতে ভাগলো, আর অন্য দুইজনকে, লোকজন রাক্সা হান্দাইয়া দিলো পেটে আর লোকগুলোর হেকি কান্দন—মুঝে মাপ করদো, কসুর হো গিয়া, তোম লোক সব দোস্ত হো, বলে দাদা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসতে হাসতে বললেন—বাঙালির কথা হুনছে, দেহেতো নাই। তহনই বুজলো কারে কয় বাঙালি।

দাদার কথা শুনে সবাই খুশিতে হাততালি দিলো। ফুপা বললো—সাবাস, সাবাস দাদাভাই, দারুণ ক্যাচকা মাইর দিছেতো লম্বুগো।

ছোট ফুপুর বড় মেয়ে তিন্নি ক্লাশ ফাইবে পড়ে। বললো—দাদা, মাছের মতো করে মারলো!

মাছের মতো! যে ভাবে কোচ দিয়ে মাছ গাঁথে সেই ভাবে?

তিন্নি সবিস্ময়ে আবারও বললো—ওদের বন্দুক ছিলো না!

আরে না, কিসের কি বন্দুক। হাজার হাজার লোক যহন লাঠি সোটা নিয়া ছুটলো, ওদের একদম টাসকা লাইগ্যা গেলো। কি আর করবে। এমন হা কইর‍্যা তাকাইলো যে মুখের মধ্যে মাছি আয় যায় অবস্থা। হেই অবস্থায়ই ধরা খাইলো।

সবাই ধরলে দাদা অবশ্য মাঝে মধ্যে নানা বাড়ির ভূতের গল্পও বলেন। তবে সে জন্য তার মন মেজাজ ভাল থাকা চাই। সেবারও তিন্নিরা আছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, অমাবস্যার রাত। তিন্নির মা সফুরা এ ঘরের ছোট মেয়ে, দাদার ছোট বোন। খাবার পরে পান নিয়ে বসেছে। শীতের দিনের অকাল বৃষ্টিতে শীত জেঁকে বসেছে।

তিন্নি মাকে ধরলো মামনি, ও মা--ম-নি, দাদাকে একটা ভূতের গল্প বলতে বলো না।

দাদারও খাওয়া শেষ। একটা ছোট ঢেকুর তুলে সফুরাকে বললেন—একটুখানি পান সুপারি দেতো দেহি।

সফুরা পান দিতে দিতে বললো, দাদা, সেই বাগের বাড়ির বুড়ির গল্পটা বলো না। তিন্নি বড্ড ধরেছে।

দাদা আয়েস করে বসলেন। পানটা হাতে নিয়ে একটু খানি চুন মাখিয়ে মুখে পুরে বললেন—তোগো নিয়া আর পারা গেলো না, ভূতের গল্প হুনবি তাও কিনা অমাবস্যার রাতে।

সফুরা সর্তা দিয়ে কুচি কুচি করে সুপারি কাটছে। সে জানে দাদাকে ঘায়েল করার মোক্ষম অস্ত্র কুচি কুচি করে কাটা সুপারি। তার খানিকটা দাদার হাতে দিয়ে বললো—তিন্নি যে ছাড়ছে না দাদা।

হ, বলে দাদা পান চিবুতে শুরু করেছেন। খানিকটা কাঁচা সুপারি মুখে দিতেই তার মেজাজ আর দিলও খেলাসা হতে শুরু করলো। রানা গল্পের গন্ধ পেয়ে বই ফেলে চলে এসেছে দাদার কাছে। তিন্নির বড় ভাই রাসেলও উপস্থিত। দেখতে দেখতে ভিড়টা বড় হলো। ছোট ফুফাও পান খাবার উছিলায় গ্যাঁট হয়ে বসলো।

দাদা, বাচ্চারা যখন ধরেছে, শুনিয়ে দেন একটা যুৎসই গল্প। শেষে ফুপাও অনুরোধ করলো।

দাদা গল্প বলার সুযোগ পেলে খুশি হন তবু ভাবটা এমন যেন বেজায় কষ্টে আছেন। বললেন—না, তোদের নিয়ে আর পারা গেলো না । অর্থাৎ দাদা রাজি। দাদা তখন ছোটখাট একটা খানদানি ঢেকুর তুলে শুরু করেছেন ------

সে এক ভয়ানক বুড়ি, থাকে নানা বাড়ির পশ্চিমের বাগানে ঐ যে বড় বাঁশঝাড়টা আছে না, সেহানে। মা তখন খুব ছোট। আমার নানি বুঝলি, ঘুমাইয়া ছিলো। দেহে কি বুড়ি আইছে, গায়ে এতো বড় বড় লোম, কটা কটা চোখ। নানিকে আইয়া কইলো, লুৎফা, চল, তোরে এক হাঁড়ি টাকা দিমু।

নানির মনে সন্দেহ অইলো। কইলো—আমার ধলা ছোট্ট, ওরে ফালাইয়া আমি যামু না। রাসেল জিজ্ঞেস করলো—দাদা, ধলা কে?

সফুরা হাসলো বললো, মা খুব ফর্সা ছিলো, সেইজন্য ছোট বেলায় তাঁকে সবাই ধলা বলে ডাকতো।

ছোট ফুফা স্ত্রীর দিকে ফিরে চোখ পাকালো।

বললো—তুমি বাগড়া দিও না তো, বলতে দাও দাদাকে।

দাদা তখন খুব মুডে। বললেন—রাত প্রায় শেষ। বুড়ি বারবার কইলো, চল তোরে ধনী বানাইয়া দিমু। নানি ভয়তে এতোটুকু হইয়া গ্যাছে। বললো, না আমার ধলা ছোট্ট, আমি যামু না, আমার ধনী হওন লাগবো না।

তুই যাবি না তা অইলে? বলেই বুড়ি নানুর ডান হাতের একটা আংগুল ধইরা দিলো একটা হ্যাচকা টান। ....বলে দাদা চোখ বড় করে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। গল্পের তোড়ে ততক্ষণে তিন্নি ওর মায়ের আঁচলের নিচে, রনি ওর দাদা ভাইয়ের কোলের মধ্যে আধাআধি সেঁধিয়ে আর রাসেল ওর আব্বু মাঝামাঝি গুটিয়ে নিজেকে বৃত্তের আকারে ছোট করে ফেলেছে। সফুরা হারিকেনের আলোটা আরো খানিকটা উসকে দিলো। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভয় তার ভিতরেও সংক্রমিত।

একটু নড়ে চড়ে বসলো ছোট ফুপা।

বললো—দাদা তারপর?

দাদা হাত-পা নাড়িয়ে বললেন—ঠাস, ঝন, ঝন ঝন ঝনর। বিকট শব্দ আর নানির চিৎকার। ভোরে রাতে নানা, তার বড় ভাইসহ বাড়ির অন্যান্য সব পুরুষ লোক ছুইট্টা আইলো। দেখে নানি ভয়তে কাঁপছে। মুখ সাদা কাগজের মতোন আর ঘরের বেড়ার একটা টিন ছুইট্যা এদিক ওদিক ....। দাদা তাঁর ডান হাত ডানে বাঁয়ে আস্তে আস্তে দুলিয়ে বললেন, এইভাবে হেলতেছে। নানা নানিকে জড়াইয়া ধরলো। নানির মুখে পানির ছিটা দিতে দিতে সে চোখের পলক ফালাইয়া তাকাইলো।

নানা কইলো—লুৎফা, কি অইছে। চোর না ডাকাইত? নানি তহন আবার কাঁপতে কাঁপতে খালি কইল—বুড়ি আইছিলো বু------ড়ি------বলেই জ্ঞান হারালো নানি। মুখে তার গাজলা উইঠ্যা গেলো। আর সবারই হেই কি দৌড়দৌড়ি।

বাইরে কোথাও হঠাৎ একটা পেচা ডাকতেই সবাই হারিকেনের চারপাশে আরো ঘন হয়ে বসলো।

দাদা বললেন—বলছিলাম না, অমাবস্যার রাত ভাল না। তা তোর হুনলি কই? শেষপর্যন্ত পেচা তো ডাকলো। বলতে বলতে একটা হাই তুললেন দাদা। তারপর বললেন—যাই, একটু হাঁটহাঁটি করি। ভাতটা হজম করণ লাগবো তো।

দাদা কিন্তু তার দু'ভাইয়ের জন্য জীবন বাজি ধরে বসে আছেন। ওদের যে কোন অনুরোধ বা আবদার যে কোন সময় রক্ষা করেন। ভাই বলতে তিনি অজ্ঞান। মা-বাবা হারান ছোট ভাই দু'টোকে লালন-পালন করতে যেয়ে বিয়েতে দেরি করেছেন। কেউ বললে বলেন—বিয়ে? সে একটা করা যাবে। আগে সবুজ, রানা বড় অউক। আয় উন্নতি করুক, তহন দেহা যাইব।

সবুজ আর রানা কাঠ বাদামের পোকা। কয়েক বছর আগের কথা, বছর সাতেক হবে। ঐতো সেবারে যখন বন্যা হলো, একটানা সতের দিন বর্ষণ, চারদিকে শুধু পানি

আর পানি, উঠানেও হাঁটু পানি থই থই করছে। সবুজ কোত্থেকে কয়েকটা বাদাম কুড়িয়ে আনলো। পিঠাপিঠি রানার সাথে তা নিয়ে শুরু হলো মারামারি। তা দেখে দাদা ভরা বর্ষায় ছুটলেন বাদাম পাড়তে।

কাজের বুয়া বুড়ি ময়না বললো—ও ছাওয়াল, এই বর্ষায় যাইও না, গাছে ডাইয়া পোকায় ভরা, গাছও পিছলা।

দাদা বললেন, না আমার ভাইরা বাদাম খাইবে, জোগাড় করণ লাগব না? ওরা মনে কষ্ট পাইলে আমি আছি কি করতে!

দাদা বাদাম গাছ থেকে গোটা তিনেক আস্ত ডাল সমেত বাদাম নামালেন। প্রত্যেকটা ডাল পাকা পাকা গোলাপি কাঠ বাদামে ভর্তি। দাদা যখন নামলেন, তাঁর গায় তখন সারি সারি পিঁপড়া। লাল পিঁপড়া তাঁকে কামড়াচ্ছে। সব নাছোড় বান্দার দল। চেষ্টা করেও সব পিঁপড়া ছাড়াতে পারলেন না দাদা। সবাই মিলে দাদাকে সাহায্য করে পিঁপড়া ছাড়াল বটে, ততক্ষণে দাদার অবস্থা কাহিল।

শরীর ফুলে ঢোল। ডাক্তার আসলো। দাদার চোখের পাতা এতো ভারি যে স্বাভাবিক ভাবে চোখ মেলাতে পারে না। ডাক্তার চাচা সাথে সাথে ইনজেকশন দিলো একটা। তারপর বকলো খুব। সে চলে যেতেই বিছানায় শুয়ে শুয়ে সবুজ আর রানাকে কাছে ডাকলেন দাদা।

হেসে বললেন—কিরে, বাদাম খাইছ?

দাদার ফুলা ফুলা মুখে হাসিটা কেমন বেমানান লাগলো।

ওদের দিকে তাকাতে দাদাকে চোখের পাতা টেনে ফাঁক করে ধরতে হলো। ওরা দাদাকে ধরে কেঁদে ফেললো। বললো—দাদা, আর বাদাম নিয়ে মারামারি করবো না।

দাদা চোখ বুজে বুজে দু'ভাইকে আদর করতে লাগলেন।

৩

দাদা বিয়ে করেছেন।

কাজেম বললো—দাদা বিয়া তো করলো, তয় এটটু খানি দেরি অইছে মনে হয়।

দাদা মিটিমিটি হেসে বললেন—কোন দেরিই দেরি না। আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোন কাম অয়, হুনছ? আমার সবুজ আর রানা নিজের পায় খাড়াইছে। অহনই সময় এবং সময় মতোই কামডা করছি। আর জানো তো পাকা মরিচে ঝাল বেশি।

কাজেম হা হা করে হাসতে হাসতে বললো—দাদা, চুলের রুপালি রং ঢাকেন, ভাবিরও তো মন বলতে কথা।

দাদা গম্ভীর। বললেন—চুলের মধো খেজাব লাগামু? আরে ব্যাডা, হুনছি অনেকের নাকি ওডা সহ্য অয় না, চোখ, মুখ সব ফোলে। তো তহন তোমার ভাবির সামনে যামু ক্যামনে?

কাজেম মাথা চুলকালো। বললো—কতাডা কইছ ঠিকই, তয় ভাবিকে কিছুডা বেশি সময় দিও। তোমার তো সমাজসেবা করার অসুখ আছে।

কাজেম দাদা প্রতিবেশী, বন্ধু। দাদা যেমন তার ভালমন্দ জানেন, কাজেমও দাদার সুখ-দুঃখের সব কথা জানেন। এক সময় একই স্কুলে লেখাপড়া করেছে। কাজেম যতটুকুই এগুলো, দাদা কিন্তু পারেননি। অকালে বাবা-মা পরকালে পাড়ি দিলেন। আর ছোট্ট দু'টো ভাইকে নিয়ে বড় একটা সংসারের হাল সামলাতে মাল্লাই রয়ে গেলেন চিরদিন। বোন কিংবা ভগ্নিপতিরা সময় অসময়ে বেড়ানো ছাড়া আর তেমন কোন কাজে আসলো না।

দেখতে দেখতে দাদা দু'কন্যার জনক হয়েছেন। বীথি আর যূথী। যূথীর জন্মের ছ'মাসের মধ্যে স্ত্রী কবিতা সামান্য জ্বরে বিদায় নিলো। দাদা তার দু'সন্তানকে নিয়ে আবার এতো বড় সংসারে একা হয়ে গেলেন। এখন তার পঞ্চান্ন'র শরীর আর আগের মতো চলে না। সবুজ আর রানার পড়ার খরচ বহন করতে সংসারের আয় দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে এসেছে অনেক আগেই। বিভিন্ন সময় জমিজমা বন্ধকি রেখে ওদের লেখাপড়ার খরচ জোগাড় করতে হয়েছে। ওগুলো আর ছাড়ান সম্ভব হয় নি। কবিতা থাকতে বুঝে শুনে সংসার চালাতো। এবং চলতো কোন মতে। দাদা এখন সারাদিন দু'মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত। সময় কাটে কতো দ্রুত নিজেই বুঝে উঠতে পারেন না। তবু অবুঝ কন্যা দু'টোর প্রয়োজন মিটে না।

কাজেম একদিন বললো—দাদা, আর একটা বিয়ে করেন।

গভীর মমতার সাথে প্রয়াত স্ত্রীর কথা স্মরণ করলেন দাদা, মাথা নাড়ালেন এপাশ ওপাশ। বললেন—কবিতা গেলো আমাকে রাইখ্যা কিন্তু স্মৃতি থুইয়া গেলো আমার কাছে। ওদের মানুষ করতে করতেই সময়টা পার অইয়া যাইব।

কাজেম বললো—তোমার অবর্তমানে ওদের দেখবে কে, একবারও ভাবছ?

দাদা উপরে আঙুল তুলে দেখালেন। বললেন—আল্লাহ, তারপর কিছুটা গর্বের সংগে বললেন, নিচে তো আমার দুই ভাই সবুজ আর রানা রইলই।

কাজেম দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে বললো—আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন।

দেখতে দেখতে আরো বছর পাঁচেক গড়িয়েছে। সবুজ শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিয়ে করেছে ভিন দেশি এক মহিলা। একমাত্র সন্তান মেলিসা ওদের এখন আনন্দের উৎস। ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ নিয়ে এম এস করার সময় কানাডীয় ডরোথির প্রেমে বাঁধা পড়ে সবুজ। প্রথম প্রথম দেশের সাথে যোগাযোগ থাকলেও ধীরে ধীরে তা ক্ষীণ হয়ে আসতে থাকে। দাদার কথা কদাচিত মনে হয়, কিন্তু কেমন যেন গাঁয়ের স্মৃতিগুলো সিডনির ঝলমলে উজ্জ্বলতার মাঝে ম্লান হয়ে যায়।

রানা ঢাকায় যশস্বী সরকারি কর্মকর্তা। কাজের চাপে বেশ কয়েক বছর দেশে যাওয়া হচ্ছে না। বিয়ের পরে দাদা দু'একবার ও'র বাসায় এসেছেন। তবে এক দিনের বেশি একবারও থাকেন নি। আচ্ছা, দাদা কেমন আছেন! আবার কাজের ব্যস্ততায় ওর সময় এবং স্মৃতি হারিয়ে যায়।

সময় গড়ায় স্রোতের মতো, নালা খাল নদী হয়ে যে ভাবে সাগরে চলে আসে জলরাশি মহাসংগমে। যেন কোন শীতের বৃক্ষ, ফুলে ফলে সবাইকে হাসিয়ে কাঁদিয়ে নির্জীব, নিঃস্ব। দাদা যেন সেই শত সহস্র বৃক্ষের একটি। সময়ের স্বাক্ষর বহন করেছেন দেহে, মনে। এবারে তিনি ষাটের ঘর পার হয়েছেন। ইতিমধ্যে বীথি আট আর যূথী ছ'বছরের। দাদা ওদের আর সঠিক ভাবে লালন পালন করতে পারছেন না। বছরে দু'টো ফ্রক দেওয়াও মুশকিল।

কাজেমের অসুখ। তবুও দাদার চলাফেরাটা এখন বেশ কষ্টকর, শরীর যেন আর ভার বইতে চাইছে না। দাদা দেখতে গেলেন ওকে। কাজেমের মাথায় তেল লাগিয়ে দিচ্ছে ছোট ছেলে রইস। ওর স্ত্রী তালপাতার পাখা নেড়ে বাতাস দিচ্ছে। এবার গরমটাও ঠাসা। কাজেমের স্ত্রী দাদাকে একটা পিঁড়ি দিলো বসতে।

দাদা বললেন— কাজেম, তোমার শরীর অহন কেমন ?

কাজেম একটু হাসলো। বললো—দাদা, দেখতেই তো পান, আল্লাহ ভালই রাখছে। তয় এবারে জ্বরটা আমার ভোগাইলো বেশ। তা আপনার এতো কাহিল দেখাইতেছে ক্যান?

দাদা কিছুটা ক্লান্ত গলায় বললেন—রোদের মধ্যে আইছি, আর তাছাড়া বয়স তো কম অইল না?

কাজেমের স্ত্রী সায়েরা হাতের পাখা রেখে পিরিজে ক'টা বিস্কুট আর এক গ্লাস পানি এনে রাখলো। বললো—দাদা, আপনি খান। তয় আপনার মুখখান কিন্তুক সত্যিই মেলা শুকাইছে।

হঠাৎ দাদা একটু ভাবুক ভাবুক কণ্ঠে বললেন—লম্বা দৌড়ের শেষ মাথায় ভাবি, একটু তো শুকাইবই। তারপর হাত বাড়িয়ে একটা বিস্কুট নিয়ে ধীরে সুস্থে মুখে পুরলেন। চিবুতে থাকলেন উদাস দৃষ্টি বাইরের ঠাঠা রোদ্দুরে মেলে দিয়ে বসে থাকলেন।

কাজেম ওঁকে বললো—দাদা, আপনের গায়ের জামাটা বড্ড পুরানা অইছে। আমার কাছে একটা নতুন জামা আছে, নেবেন?

দাদা বিষম খেলেন। তাড়াতাড়ি পানির গ্লাস মুখে তুলে পানি খেলেন ঢক ঢক করে। উঠলেন তড়িঘড়ি। বললেন—কাজেম, একটু আসি। জলদি জলদি ভাল অও। বলে আর দাঁড়ালেন না। বাড়ির দিকে ফিরতি পথ ধরলেন।

শেষপর্যন্ত দাদা খুঁজে খুঁজে সবুজের আর রানার ঠিকানা বের করলেন। ভেবেছিলেন কখনো ভাইদের কাছে নিজের জন্য সাহায্য চাইবেন না, চাইতেনও না। আহা ওরা ছোট ভাই, ওদের কাছে হাত পাতা লজ্জা বৈকি। কিন্তু আজ কাজেম যখন শার্ট দিতে চাইলো তখন অনুভব করলেন, ওঁর গায়ে ছেড়া শার্ট ছাড়া আর কিছু নাই। কিছুটা লজ্জা আর দুঃখ দাদাকে যেন চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরলো। খুঁজে খুঁজে বীথির স্কুলের খাতা থেকে দু'টো পাতা ছিড়লেন। তারপর কলম নিয়ে লিখতে বসলেন। ঠিকানাহীন চিঠি লিখলেন আর ছিড়লেন। নাহ! নিজের অভাবের কথা ভাইদের বলে নিজেকে কিছুতেই ছোট করতে পারলেন না ! বীথি বললো—আব্বু, তোমার কী হইছে? তুমি এতো কী চিন্তা করছ?

যুথী কথা বলে ভালই তবে এখন শুকনো মুখে একটু দূরে বসে। ওর মন খারাপ, আজকে ভাতের সাথে ক্ষেত থেকে তোলা লাল শাক ছাড়া আর কিছু নেই।

মেয়েদের মুখের দিকে তাকালেন দাদা। ওদের মাঝে যেন সবুজ আর রানার ছায়া। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। বললেন—কবিতা! তুমি আমারে একলা ফালাইয়া কেন গ্যালা, এই বাচ্চা দুইটা মানুষ করার ক্ষমতা তো আমার নাই!

বছর পেরুতে পেরুতে দাদাকে কঠিন রোগে ধরলো। এখন তাঁর বিছানা থেকে ওঠা বেশ কঠিন। বীথি আর যুথী একদম অসহায়।

বীথি বললো—বাবা, তোমার সবুজ রানা কই? তোমার তো অসুখ। তারা দেখতে আসবে না? তোমার কাছে তো খালি গল্প শুনলাম, আমরা তো তাদের কখনো দেখলাম না।

দাদা অভিমানে চোখ বুজে থাকলেন। তার বন্ধ চোখের কোন দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে গরম কয়েক ফোঁটা পানি বেরিয়ে এলো।

যুথী বললো—আপু, আব্বার কি অইছে?

বীথি দাদার চোখের কোন থেকে পানি মুছে দিলো। দাদা একবার তাকিয়ে তার দু'কন্যাকে মলিন বসনে দেখে আবার চোখ বুজলেন। না, তাঁর কষ্ট হচ্ছে। এখন আর তাঁর ছোট বোনরাও তেমন কোন খোঁজ খবর নেয় না। বেড়াতে আসে না। কদাচিৎ দেখা হলে সংসারের ব্যস্ততার কথা বলে। সম্ভবত তাদের আপ্যায়ন করার ক্ষমতা দাদার নেই। সেটাও একটা কারণ বৈকি, যদিও মুখ ফুটে তা কেউ বলে না।

বীথি কাজেমকে সংবাদ দিলো। বললো—চাচু, আব্বুকে ডাক্তার দেখান। আব্বুর অসুখ, বিছানা থেকে উঠতে পারে না।

কাজেম দায়িত্ব নিলো দাদার চিকিৎসার। ডাক্তার এলো।

দাদা বললেন—চিকিৎসা লাগবে না, এমনিতেই ভাল অইয়া যামু।

কাজেম চোখ পাকালো। বললো—দাদা, আপনার কথা এবার আর শুনুম না।

দাদা রানার ঠিকানা সংগ্রহ করে চিঠি লিখলো।

রানা ভাই,

সালাম রইলো। আশা করি সবাইরে লইয়া ভাল আছ! বহুদিন অইলো দেশে আস না। হুনছি আল্লায় তোমারে বহুত বড় বানাইছে। দোয়া করি আরো বড় অও। তয় তোমরা তোমাগো ছোট্ট বেলার গ্রামডারে এক্কেবারে ভুইল্যা যাইবা হেডা কিন্তুক আশা করি নাই। তোমাগে দ্যাহাতো নাই-ই, খোঁজও নাই। সবুজ তো শেষ পর্যন্ত দেশান্তরী অইলো।

তোমার যে একটা ভাই ছিলো, বড় ভাই, যারে তুমি খুব আদরে দাদাভাই বইল্যা ডাকতা, হের কথাডাও মনে অয় তোমার মনে নাই। তয় মনে করতে চেষ্টা কর। যার কান্দে উইঠ্যা হারা গ্রামডা ঘুরছ, খল খলাইয়া হাসছ, মজা করছ, যার জন্য লেহাপড়া শিখলা, আল্লায় বড় বানাইলো, হের তো খোঁজ নিলা না? তোমাগো জন্য বিয়াও করলো না সময় মতো। যা ও বা করলো, অকালে ভাবিডা মরলো, রাইখ্যা গেলো দুইডা মাইয়্যা। বুড়া বয়সে দাদায় এই দুইডারে কি ভাবে সামলাইব! তোমরা বড় অইছ। না বুঝলে বুঝাবার সাধ্য তো আমার নাই। পরিশেষে, তোমার দাদভাইয়ের অসুখ, যখন তহন অবস্থা, যদি মন চায় দেইখ্যা যাও।

ইতি-

তোমাদের কাজেম ভাই

আরো দিন দশেক পরে কমিশনার সাব্বির আহমেদ রানার কাছে চিঠিটা পৌছুলো। জরুরি মিটিং অ্যাটেন্ড করে যখন অফিসে ফিরলো, তখন প্রায় তিনটা বাজে। হঠাৎ খেয়াল করলো টেবিলের উপর এলোমেলো হাতে ঠিকানা লেখা একটা চিঠি পড়ে আছে। চিঠিটা খুললো রানা। পড়লো। বুকের কোথায় যেন একটা ব্যথা চিন চিন করে উঠলো। আহা দাদার অসুখ! দাদা ভাই কেমন আছেন! দু'টো বাচ্চা নিয়ে কেমন করছেন দাদা ভাই। না, বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। ইন্টারকমে পিএ-কে বললেন—আমার সাত দিনের ছুটি মঞ্জুর করাও, বাড়ি যাবো। রানা যখন পাঁচটায় বাসায় ফিরলো, মৌসুমি তার মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে তাকালো। জিজ্ঞেস করলো—রানা, কী হয়েছে? এতো মলিন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে? কোন সমস্যা? রানা ক্লান্ত কণ্ঠে বললো—হ্যা মৌ, মনে হয় একটা ভুল করে ফেলেছি।

মৌসুমি বিউটি পার্লার থেকে চুলের একটা নতুন ডিজাইন করিয়ে এসেছে পার্টিতে যাবে বলে। মুখে সযত্নে লালিত মেকআপ। কণ্ঠে উপচে উঠা উৎকণ্ঠা নিয়ে বললো—বড় কোন সমস্যা? মামাকে কিছু বলতে হবে? কোথাও তোমাকে বদলি টদলি করেনি তো?

না, তা নয়। রানার কণ্ঠে বেদনার ক্লান্তি। বললো—দাদা মনে হয় গুরুতর অসুস্থ। আমি কালকেই গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি। তুমি যাবে আমার সাথে? স্ত্রী'র দিকে তাকালো রানা।

তুমি গিয়ে ওদের নিয়ে আস, আমার গ্রামের পানি সহ্য হয় না।

উর্মি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে। বললো—বাপ্পি, আই ওয়ান্ট টু অ্যাকম্পেনি ইউ। আই ওয়ান্ট টু সি ইউর ভিলেজ।

ছোট বেলা থেকে ইংলিশ স্কুলে পড়ুয়া মেয়ের কথায় রানা একটু হাসলো।

বললো—ওকে ডিয়ার, ইউ উইল গো।

গ্রামে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। কমিশনার সাব্বির আহমেদ এসে পৌছবে বেলা একটা নাগাদ। পুলিশের একটা দল এসেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা যাচাই করে গেছে।

বীথি এসে দাদাকে বললো—আব্বা, গ্রামে অনেক পুলিশ। বাজারে যেহানে গাড়ি আইয়্যা থামে, শহর থেকে কে যেন একজন আইব। আমি একটু যাই? দাদার মুখ থেকে হ্যাঁ শোনার জন্য বীথি অনুয়ের ভংগিতে ওর দিকে তাকালো।

দাদার মাথার উপর বড় একটা ঝুলান হাঁড়ি থেকে ঠাণ্ডা পানি ছোট মারায় নেমে আসছে। আজকে তার জ্বর খানিকটা কম। দাদা ফ্যাকাসে আর দুর্বল হয়ে গেছেন। বীথি যা-ই করে যুথী ঠিক তাই-ই করে। সেও এসে দাদার সামনে দাঁড়ালো।

বললো—আব্বু, আমিও যাই।

দাদা দুর্বল হাত তুললেন। ফ্যাসফ্যাস গলায় বললেন—যা তোরা, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে পড়িস না যেন।

দাদার সেবা শুশ্রূষার জন্য মরিয়ম বেগম আছে। কাজেম দাদার নিষেধ সত্ত্বেও তাকে কাজে রেখেছে। ময়নার মা চলে যাবার পর দাদা এতো বছর আর কাউকে রাখেনি। মরিয়ম বেগম কলসে আরও খানিকটা পানি ঢালতে ঢালতে বীথি আর যূথীর দিকে লক্ষ্য করে বললো—তোমরা অইলা মাইয়্যা, কতক্ষণ বইয়া থাকবা। রোদে কষ্ট অইবো না?

বীথি-যুথী একত্রে বললো—কষ্ট কিসের? যামু আর আমু। গাড়ি আর সাহেব দেখতে কেমন লাগে আমরা তো কখনো দেহি নাই।

কে কার আগে কথা বলবে তার প্রতিযোগিতা চলছে ওদের মধ্যে, তবে বক্তব্য শেষ করলো দু'জনে একত্রেই। দাদার মলিন মুখে হাসি ফুইলো। ছুটে যাওয়া মেয়ে দু'টোর দিকে যতক্ষণ দেখা যায় তাকিয়ে রইলেন তিনি।

বাজারের কাছে ব্রিজের পাশে বীথি-যুথী হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে। প্রায় ঘণ্টা খানেক হলো। হঠাৎ দূরে একটা গাড়ি দেখা গেলো। পুলিশ উঠে বাঁশি বাজিয়ে খানিকটা দূরে সরিয়ে দিলো ভিড়টা। গাড়ি এসে দাঁড়াতে দরজা খুলে দিলো দারোগা সাহেব লম্বা স্যালুট দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

ধীরে ধীরে নামলো কমিশনার। তার সাথে ফুটফুটে একটা মেয়ে। বীথি বললো—দ্যাখ যুথী, কি সুন্দর মাইয়্যা, পুতুলের মতো না?

যুথী বললো—হ্যাঁ আপু, আমাদের চাইয়্যা একটু লম্বাও।

রানা নেমে চারদিকে তাকালো। ওর শরীরে হালকা আনন্দের ঢেউ। সেই চেনা পথ, রাস্তা, মাঠ, বাজার সবই ঠিক আছে। তারপরও কোথায় যেন একটা পরিবর্তন। কমিশনার রানা চোখের গগলসটা খুলে নিলো। বললো—দারোগা সাহেব, আমি আমার বাড়িতে যাবো। এতো আয়োজনের কোন দরকার ছিলো না।

বিস্ময়ের সাথে দারোগা বললো—বলেন কী স্যার? আপনার পদধূলি পড়েছে, আমরা খুশি। আপনাকে এখানে অভ্যর্থনা জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত।

কমিশনার ব্রিজ পার হয়ে এলো। লোকজনের ভিড় বাড়ছে। কেউ হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডসেক করছে। কেউ কেউ আবার দূর থেকে বলছে—আমাদের রানা না? কেউ কেউ আবার সভয়ে ফিস ফিস করে কথা বলছে! পুলিশ তাদের কাউকে কাউকে সরিয়ে দিচ্ছে।

হঠাৎ দেখা গেলো ব্রিজের একপাশে দাঁড়ানো দু'টো বাচ্চা ভিড়ের মাঝ থেকে উঁকি দিয়ে কমিশনার রানাকে দেখার চেষ্টা করছে। কমিশনার সাব্বির আহমেদ রানার বুকের ভিতর কেমন যেন একটা দোল খেলো। দারোগাকে বললো—বাচ্চা দু'টোকে একটু ডাকুন তো।

দারোগা সাহেব ওদের সামনে নিয়ে এলো। বীথি-যুথী সভয়ে তাকালো রানার দিকে। উর্মি বললো—বাপ্পি, ভেরি সুইট বেবি।

রানা ওদের দিকে তাকালো। মলিন মুখে কেমন চেনা চেনা ছাপ। রানা ওদের কাছে ডাকলো।

জিজ্ঞেস করলো—মা মনি, তোমাদের নাম কী?

কে একজন ভিড়ের মধ্য থেকে বললো—ওরা দুইজন দাদার মাইয়্যা।

রানার শরীর কেঁপে উঠলো। মলিন কাপড়ে ওদের দেখে ওর বুকের চাপা ব্যথাটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। সবাইকে অবাক করে দিয়ে বীথি-যুথীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো রানা, কিছুটা ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে। তারপর ওদের দিকে তাকিয়ে বললো—আমাকে চিনতে পার?

বীথি-যুথী একত্রে মাথা নেড়ে বললো—না, আপনারে চিনি না, আমরা কি আপনারে দেখছি কখনো?

আপনি তো ঢাকার সাহেব। আমরা দুইজনে সাহেব দেখতে আইছি। বীথির চটপটে জবাব।

রানার চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো— আমার কোলে এসো মামনি।

বীথি-যুথী খানিকটা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এলো কাছে।

তোমার চাচাদের নাম শুনেছ? প্রশ্ন করে তাকিয়ে থাকলো রানা।

হ্যাঁ শুনেছি। দু'বোন একত্রে ঘাড় কাত করলো ।

আমার চাচা সবুজ আর রানা। অনেক বড়, অনেক দূরে থাকে। তাই আসতে পারে না। বীথির আবারও চটপটে জবাব।

কত দূরে থাকে, জান? প্রশ্ন করে ওদেরকে কোলের আরো কাছে টেনে নিলো রানা।

না, তবে আসলে আমাদের অনেক আদর করবে। আব্বু বলেছে, তারা অনেক অনেক ভাল। এবার জবাব দিলো যুথী।

রানা বললো—মা মনি, তোমরা আমার কোলে আস। ভাল করে দেখতো আমাকে তোমাদের চাচার মতো লাগে কিনা?

বীথি মাথা নাড়লো। বললো—বলতে পারি না। চাচাদের কখনো দেহি নাই।

রানা ওদের প্রায় আঁকড়ে ধরলো। বললো—আমি যদি তোমাদের রানা চাচা হই, আমার কোলে আসবে!

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলো দু'বোন।

আয় মা, আমার কোলে আয়। তোদের ভুলে থাকার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দে। আমিই তোদের রানা চাচা। রানার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেলো।

রানা চাচা! বলতে বলতে বীথি-যুথী রানার কোলের মধ্যে মিশে গেলো। দু'জনে ছোট ছোট চার হাতে দু'দিক থেকে গলা জড়িয়ে ধরলো রানার।

রানা ওদের গভীর মমতায় বুক চেপে ধরেছে। ওর চোখ ঝাপসা, এক্কেবারে ঝাপসা যেন মাঘের ঘন কুয়াশা ঢেকে দিয়েছে দৃষ্টি। শুধু মনে হলো দাদা ভাইয়ের কোলে চেপে ছোটবেলার রানা দোল খেতে খেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ধানের খেতে, বাগানে, পুকুর পাড়ে, পোকা ধান ক্ষেতের আলে, জ্যৈষ্ঠ মাসে গাছের ছায়ায়, জ্যৈষ্ঠ মাসের ভরা দুপুরে পাকা কাঁঠালের মিষ্টি গন্ধ, আহ------কি--আ-----রা----ম। কি, মি----ষ----টি।

রানা বীথি-যুথীকে দুই কাঁধে নিয়ে ওর চেনা পথ দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা শুরু করলো। পাশে পাশে হাঁটছে উর্মি। সে তার বাবাকে এতো খুশি আর কখনো দেখেনি।